ষষ্ঠ অধ্যায়

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায় - সুকান্ত ভট্টাচার্য

"জানি তবু জানি

নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়-

আরও এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর

খেলা করে;

আমাদের ক্লান্ত করে

ক্লান্ত ক্লান্ত করে;"

('আটবছর আগের একদিন', 'মহাপৃথিবী')

এই কথাগুলি বলেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দের এই বিপন্ন বিস্ময়কে আমরা যেন পুরোপুরি ধরতে পারি না আমাদের ভাবিয়ে তোলে, কি ছিল তাঁর এই বিপন্ন বিস্ময়। আবার অনেকদিন পরে আরও এক কবির মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম সেই বিপন্ন বিস্ময়কে, যার শিশুকাল থেকেই তাঁর রক্তের ভেতর খেলা করে চলছে এই বিপন্ন বিস্ময়, তিনি হলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। কিন্তু সুকান্ত ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে এই বিস্ময় আমাদের কাছে আর ভাববার বিষয় হয়ে থাকে না, তা যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়, কারণ তিনি নিজে মুখেই সে কথার উত্তর দিয়ে গেছেন আমাদের-

"-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,

এ শিশুকে এ পৃথিবীর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি-

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

('ছাড়পত্র', 'ছাড়পত্র')

অল্প বয়স থেকেই তিনি তা করতে শুরু করলেন এবং করলেনও কিন্তু তাঁর সময় ছিল খুবই কম। মাত্র একুশটি বসন্ত নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি। আর তার মধ্যেই বাংলা কবিতার জগতে নিজের নামকে স্বর্ণাক্ষরে খঁচিত করে গেলেন নিজের যোগ্যতায়, মানুষের সেবার দ্বারা, আর যে মাধ্যমকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তা হল কবিতা। আর তার কবিতার জগতকে অনুধাবন করতে হলে আমাদের অবশ্যই তাঁর জীবন জগতকে অনুধাবন করতে হবে।

দিনটি ছিল ১৯২৬-সালের ১৬ আগস্ট, কলকাতায় মাতামহ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কালীঘাটের ৪২-নং মহীম হালদার স্ট্রীটের বাড়িতে নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ও তার দ্বিতীয় স্ত্রী সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্ম নিলেন। দাদু সতীশচন্দ্র তেমন ভাবে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও ছিলেন জ্ঞানী এবং বিদ্যাচর্চায় বেশ আগ্রহের সুবাদে ব্যক্তিগত অনেক ইংরেজি বই ছিল তাঁর সংগ্রহে। বাড়ির পরিবেশ ছিল কুসংস্কার মুক্ত। এক উদার পরিবেশে চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল সুকান্তের। তাঁর দিদিমার একটি ছোট্টো গল্প শুনলেই আমরা তাঁদের বাড়ির এবং উদার মানসিকতার চিত্রটি বুঝতে পারবো-

*"--- এমনও দেখা গেছে যে, ভিকিরি বউকে তিনি বলেছেন, বাচ্চাকে তাঁর কাছে রেখে যেতে। কারণ তাকে নিয়ে রোদে রোদে ঘুরলে বেচারির কষ্ট হবে। তিনি বাচ্চাকে শুধু তাঁর বাড়িতে রেখে দিতেন তাই নয়, স্নান করিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন। ফেরার পথে তার মা তাকে নিয়ে যেত।"*১

সমাজের নিচুতলার মানুষকে সাহায্য করাটাই এবং অন্যের কষ্টকে নিজের করে অনুভব করাই যে মানবধর্ম তা কিন্তু সুকান্তকে বই পড়ে শিখতে হয়নি, তা সুকান্ত জন্মের পরে তাঁর চারপাশের পরিবেশ থেকেই শিখেছে এবং পরবর্তী জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। সুকান্তের ঠাকুরদা যখন মারা যান তখন তাঁর বাবার বয়স দেড় বছর আর তার দাদা কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স সাত আট হবে। ফলে তাঁদের ছোটবেলা বেশ কষ্টে কাটে। সুকান্তের জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র কলকাতায় চলে আসেন, এবং বেশ কিছুদিন পরে সুকান্তের বাবাও কলকাতায় দাদার কাছে চলে আসেন। কলকাতায় এসে দুই ভাই মিলে সামান্য কিছু অর্থ ব্যয় করে একটি বইয়ের দোকান খোলেন এবং কঠোর পরিশ্রম ও সততার দ্বারা ১৯১৩-সালে "সারস্বত লাইব্রেরী" নামে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর থেকে তাঁদের আর ফিরে তাকাতে হয়নি। সুকান্তের মা-ও ছিলেন শান্ত এবং বিদ্যাচর্চায় বিশেষ আগ্রহী-

*"লেখাপড়ার প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। কবিতা ও গল্প উপন্যাস পড়ার বেশ ঝোঁক ছিল। ---কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুর করে পড়তেন। সুকান্ত মা-র কাছ থেকে সুরের ছোঁয়া কিছুটা পেয়েছিলেন মনে হয়। সুকান্ত যখন সবে বসতে শিখেছেন, তখনই কোনো গান বা আবৃত্তি শুনলে তিনি তালে তালে দুলতেন। তাঁর এক আত্মীয় তাই তাকে আদর করে ডাকতেন 'ঝুলনমণি'।"*২

সুকান্তের যখন জন্ম হয়েছে তখন তাঁদের এই পুস্তক প্রকাশনীর ব্যবসা ভালই চলছিল এবং তাঁদের পরিবারের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল

দাদা-ভাই এক সঙ্গেই থাকতেন। এই সময়ের উল্লেখ ভাল পাওয়া যায় অশোক ভট্টাচার্যের বর্ণনায়-

"সেই সময় তাঁরা বাগবাজারে নিবেদিতা লেনের একটি দোতলা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। বিরাট বাড়িতে লোকজন ছিল যথেষ্ট। কেননা দেশের চেনাজানা মানুষের শহরে প্রতিষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্যে এসে এখানেই উঠতেন প্রথমে। আর সামাজিকতায় উৎসাহী কৃষ্ণচন্দ্র ও নিবারণচন্দ্র তাঁদের সাদরে গ্রহণ করতেন। তাই বাড়িটা থাকতো সরগরম। এই বাড়িতে সুকান্তের দিন কেটেছে কখনও ঠাকুমার ঘরে কখনও বা রাণীদির কোলে। রাণীদি ছিলেন সুকান্তের জেঠতুত বোন আর বাড়ির একমাত্র কিশোরী। তাঁর কাছেই মনে হয় কবিতার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন শিশু সুকান্ত। রাণীদির কণ্ঠস্থ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি। শিশু সুকান্তকে কোলে করে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করার ফাঁকে ফাঁকে আপন মনে কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি। তখন হয়তো সেসব কবিতা শিশুমনে কাব্যের বীজ বুনেছিল।"৩

পরিবারে বেশ আনন্দেই ছিল সুকান্ত। বাড়িতে বড়দের সুবাদে বেশ পড়াশুনোর পরিবেশ ছিল, তার প্রমাণ হল চতুর্থ শ্রেণীতেই তিনি অনেক বই পড়ে-ফেলেন যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'ও তাঁর সে সময় পড়া হয়েগেছে। এই অল্প বয়সেই সে 'সঞ্চয়' নামে পত্রিকাও বের করেন এবং এও জানা যায় চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তিনি 'ধ্রুব' নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। বাড়ির এই সাংস্কৃতিক পরিবেশই তাকে সুকান্ত করে তুলেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলে না, যৌথ পরিবার ভেঙে যায়, আর হটাৎ রাণীদির মৃত্যু হয়। এই দুই ঘটনা সুকান্তের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানে। সে ক্ষত বিক্ষত হয় এবং তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, কিশোর

সুকান্তের মনে যেন প্রথম বাস্তবের রূঢ়তা হাতছানি দিল। সুকান্তের অন্তরাত্মা জাগতে শুরু করলো। দুই ভাঙ্গা পরিবার আবার এক হলেও পরিবার বিচ্ছেদের যে ঘা তা শুকিয়ে গেলেও দাগ কিন্তু থেকে যায় ফলে আগের মতো মিলেমিশে আর থাকা হয় না।

১৯৩৫-সালে সুকান্তের পরিবার সাঁওতাল পরগণায় হাওয়া বদলের জন্য যায়। সেখানেই যেন সুকান্তের কবিত্বের প্রথম দ্বার উদঘাটন করলেন জ্যাঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্য। সুকান্তের সম্ভাব্য প্রথম কবিতা –

"রমা রাণী দুই বোন, পরির মতন

সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন।

দুই বোন রমা রাণী-

সবে করে কানা কানি,

দুই বোন হবে ভালো,

করিবে যে ঘর আলো,

সীতার মতন।।"

মনোজ ভট্টাচার্যের মামাতো বোন রমা, জ্যাঠতুতো বোন রাণী যাঁদেরকে সুকান্ত খুবই ভালোবাসতেন। যাইহোক এই কবিতা থেকে বোঝা যায় যে সুকান্ত রাণীদির মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই কবিতা লেখা শুরু করে দিয়েছিলেন। রাণীদির মৃত্যুর শোক যখন সুকান্তের মন কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তখনই তাঁকে পেতে হল আরেকটি গভীর শোক, ১৯৩৭-সালে সুকান্তকে ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর মা। তার চেয়েও বড় কথা সুকান্ত তখন ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মা কে শেষ দেখাও তাঁর আর

হল না। এইভাবে এই অল্প বয়সেই তাঁর দুই স্নেহের, দুই ভালোবাসার আশ্রয় তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। এর ঠিক একবছর পরে জ্যাঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্যের মৃত্যু হল, এইভাবে একের পর এক মৃত্যু সুকান্তের ভেতরের পরি-কাঠামোকে পরিবর্তন করে রেখে দিয়েছিল। তাঁর মন যেন শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করলো। তার বর্ণনা পাই ভাই অশোক ভট্টাচার্যের লেখায়-

"ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পরবর্তী দিনগুলির নির্জন অবসরে সুকান্তর মন হটাৎই যেন দ্রুত পরিণতির দিকে ছুটে চললো। সে মনের যথাযথ প্রকাশ ঘটতে থাকলো তাঁর রচনায়; দিনে দিনে গদ্যে-পদ্যে ভরে উঠলো একটা বাঁধানো খাতার পাতা। বেদনা আর বিধুরতায় দ্রব হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে তাঁর লেখা শৈশব থেকে উত্তীর্ণ হল কৈশোরের স্বভাব সুলভ বিষাদে। মৃত্যুর বিস্তীর্ণ প্রভাবে কবিতা অকালেই হল জীবনের প্রতি হতাশ ঔদাস্যে আচ্ছন্ন।"[৪]

এই সময় সুকান্তের মনে মৃত্যু-চেতনাও হাতছানি দিয়েছে। অশোক ভট্টাচার্যের বর্ণনায় তার প্রমাণ পাই-

"সুকান্তের মন ছিল স্বভাবতই অন্তর্মুখী। দশ-এগারো বছর বয়সে ছেলেরা যখন দল বেধেঁ হল্লা করে, কিংবা ফুটবলের পিছনে ছুটে শারীরিকভাবে বেড়ে উঠে, তখন তাঁর বিচ্ছেদবিধুর নিঃসঙ্গ হৃদয় বাঁধানো খাতাটির পাতায় মুক্তি খুঁজছিল। ভাষা দিয়ে বাঁধতে চাইছিল মনের গভীরতম কেন্দ্রে সদ্যোজাত অর্ধস্ফুট ভাবকে, রূপ দিতে চেষ্টা করছিল সূক্ষ্ম অনুভূতির। সুকান্তের তখনকার মানসিক অবস্থার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে 'রাখাল ছেলে' নামক একটি রূপক গীতিচিত্রে।"[৫]

'রাখাল ছেলে'তে দেখি যখন বাঁশী শুনতে শুনতে হরিণীর মৃত্যু হয় তখন রাখাল ছেলে তার সঙ্গীকে হারিয়ে মনের দুঃখে বলে-

"বিদায় দাও গো বনের পাখি!

বিদায় নদীর ধার,

সাথীকে হারিয়ে আমার

বাঁচা হল ভার।"

এই অবস্থায় বনের সমস্ত পাখি, নদীর ধার সকলে তাকে যেতে নিষেধ করে, কিন্তু রাখাল ছেলে এতটাই দুঃখ পায় যে সে আর এই বনে থাকতেই চায় না, সে তাদের উদ্দেশ্যে বলে-

"ডেকো না গো তোমরা আমায়

চলে যাবার বেলা,

রাখাল ছেলে খেলবে না আর

মরণ-বাঁশির খেলা।।"

এইভাবে সুকান্ত বিভিন্ন বেদনা বিষাদময়তা নিয়ে বড় হতে থাকে, সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ভর্তি হয় বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে। সেখানেই তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে তাঁর পরবর্তী কালের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু অরুণাচল বসুর সাথে। যার অনেক প্রভাব রয়েছে সুকান্তের পরবর্তী জীবনে। বন্ধু অরুণাচল বসু ও শিক্ষক নবদ্বীবচন্দ্র দেবনাথের তত্ত্বাবধানে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি পত্রিকা বের হয় 'সপ্তমিকা' নামে, যার সম্পাদক ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। আর এই পত্রিকার জন্য তিনি লিখেছিলেন 'সুচিকিৎসা' ছড়াটি, ঠিক একই সময়ে আবার ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য হাতে লিখে বের করেন 'নাগরিক' পত্রিকা, সেখানে সুকান্তের 'ভবিষ্যতে' কবিতাটি প্রকাশ পায়-

"স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,

আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে হব রে ইন্ধন!

বুকের রক্ত দিব ঢালি-স্বাধীনতারে,

রক্ত পণে মুক্তি দেব ভারত-মাতারে।

মূর্খ যারা অজ্ঞ যারা যে জন বঞ্চিত

তাদের তরে মুক্তি-সুধা করব সঞ্চিত।

চাষী-মজুর দীন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই,

একস্বরে বলব মোরা স্বাধীনতা চাই।।

থাকবে নাকো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়

ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।

আমরা সবাই ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর

আমরা হব মুক্তিদাতা আমরা হব বীর।"

এই কবিতাটির রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪০সাল, তখন সুকান্তের বয়স তের-চোদ্দ বছর। সেই সময়ই তাঁর মুখ থেকে আমরা এই রকম কথা শুনতে পাই। সে স্বপ্ন দেখেছে স্বাধীন ভারতের শুধু স্বপ্ন নয়, তাতে নিজেকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন বুকের রক্ত দিয়ে এবং সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন তাতে সামিল হবার জন্যে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি তখন থেকেই সোচ্চার হয়েছেন। এভাবে ধীরে ধীরে সুকান্তের কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পেতে লাগলো সকলের কাছে। যার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল বন্ধু অরুণাচল বসু ও তাঁর মা সরলা দেবীর। সুকান্তের অনুজ অশোক ভট্টাচার্যের ভাষায় তা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে-

"দেশবন্ধু হাইস্কুলে সুকান্তের সুকান্তর সব থেকে বড় লাভ অবশ্য অরুণাচল বসুর সঙ্গলাভ। কেননা, বন্ধুদের মধ্যে অরুণাচলই তার কবিজীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। এর কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর মধ্যে সুকান্ত পেলেন এমন একজন অন্তরঙ্গ সাথীকে যাঁর জীবনে শিল্প ও সাহিত্য কেবলমাত্র সৌখিন আত্ম-বিনোদনের উপায় মাত্র ছিল না, ছিল আত্মপ্রকাশের অপরিহার্য মাধ্যম। স্বভাবতই লাজুক সুকান্তর পক্ষে, যিনি তখন পর্যন্ত কবিতা ভিন্ন অন্য সব ক্ষেত্রেই নিজেকে রেখেছে সঙ্কুচিত ক'রে, এহেন সমমর্মীকে সর্বদা নাগালের মধ্যে পাওয়াটা নেহাৎ নগণ্য ঘটনা ছিল না।

অরুণাচলেরা তখন থাকতেন বেলেঘাটার নির্জন এক পল্লীর ফাঁকা মাঠের মধ্যে ঘেরা একটি বাড়িতে। বাড়িটি ছিল মেয়েদের স্কুল। সেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন অরুণাচলের মা সরলা দেবী। সরলা দেবী নিজেও ছিলেন একজন লেখিকা। তাই তাঁর কাছেসুকান্তর একটা বিশেষ আদর ছিল- তিনি কিশোর কবিকে স্নেহ করতেন মায়ের মতোই। অরুণাচলদের ঐ বাড়িতে বহু নির্জন সন্ধ্যা কাটিয়ে আসতেন সুকান্ত। গল্প করতেন অরুণাচলের মা-বাবার সঙ্গে, শুনতেন তাঁদের ফেলা আসা সুন্দরবনের দিনগুলির কথা, আর প্রায়ই মেতে উঠতেন নানা সাহিত্যিক খেলায়। হয়তো কোন গল্প শুরু করলেন সরলা দেবী, আর সে গল্প শেষ করার ভার দিতেন সুকান্তের উপর;"[৬]

এমন ভাবেই চলছিল সুকান্তের ঘরের জীবন। কিন্তু বহির্বিশ্বে তখন এতটা শান্তি ছিল না। ১৯৪০সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন সমস্ত পৃথিবীকে তোলপাড় করছে তখন তার ঢেউ কিন্তু চোদ্দ বছর বয়সী সুকান্তের মনেও লাগলো। শুধু লাগলো না তাঁর মনকে ক্ষত বিক্ষত করে গেল। সে কষ্ট পেতে শুরু করলো মানুষের জন্যে, পৃথিবীর জন্য, তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির জন্যে। তিনি ব্যথার রূপ দিলেন 'পূর্বাভাস' কবিতায়-

"দূর পূর্বাকাশে,

বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে

মরণের শিরায় শিরায়।

মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ-

বিস্ফারিত হিংস্র-বেদনায়।

অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান

লৌহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত,

উত্তপ্ত মাটিতে ঝরে বর্ণহীন শোণিত প্রপাত।"

('পূর্বাভাস, 'পূর্বাভাস')

এই কবিতা সর্ম্পকে অশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'কবি সুকান্ত' গ্রন্থে বলেছেন-

"সঠিকভাবে বলতে গেলে সুকান্তর সত্যিকারের কবি জীবনের শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। যদিও তখন বয়স মাত্র চোদ্দ-পনেরো, তবু ঐ বয়সেই- হয়তো পারিবারিক বন্ধনহীনতার জন্যেই-যেন বিশ্বের নাগরিকত্ব পেয়ে গিয়েছিলেন সুকান্ত। তাই মহাযুদ্ধের আঘাত-সংকুল মৃত্যু-তাড়িত পরিবেশ তাঁকে করে তুলেছিল বিভীষিকাগ্রস্ত। সে দিন পুবে চীনাদের ওপর চলছে বর্বর জাপানী আক্রমণ আর পশ্চিমে ইউরোপের ছোটছোট দেশগুলোকে তাদের অসহায়তার সুযোগে একে একে গ্রাস করে চলছে হিটলারের ঝঞ্ঝা-বাহিনী-এক কথায় সমগ্র মানবতাই যেন নিদারুণ পরীক্ষার সম্মুখীন। ---তার প্রতিক্রিয়া সুকান্তর কল্পনাপ্রবণ মনে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সর্ম্পকে সংশয় এনেছিল।"[৭]

আর এই সংশয়ের প্রকাশ পেলাম এই 'পূর্বাভাস' কবিতায়।

এইভাবে ধীরে ধীরে বাইরের জগৎ-এ যে আগুন জ্বলছিল তার উত্তাপ এসে লাগে সুকান্তের কবিতায়। এই সময় পৃথিবীর চরম সংকট ছিল ফ্যাসিবাদ সমস্যা। জাতি বিদ্বেষ ছিল যাদের অন্যতম হাতিয়ার। ইতালিতে যার সূত্রপাত হয় মুসোলিনির ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে। ইতালিতে

ধনপতিরা যখন দেখল যে, কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসলে তাদের পতিপত্তি কমে যাবে এই ভয়ে তারা কমিউনিস্টদের রুখতে মুসোলিনিকে সামনে এনে তার থেকে বাঁচার চেষ্টা করল। অন্যদিকে আবার হিটলার জার্মানির ধনপতিদের আশীর্বাদে সেখানকার ক্ষমতায় আসলেন। এরপর থেকে শুরু হল অরজাকতা, শ্রমিক, নিচুতলার মানুষের উপর অত্যাচার, দেশ দখলের, ক্ষমতা দখলের ঘৃণ্য লড়াই। ড. সরোজমোহন মিত্রের ভাষায়-

"ইতালি, জার্মানী ও জাপানে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং পর পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তারা প্রতিবেশী দেশগুলি আক্রমণ করল। জাপান মাঞ্চুরিয়াকে চীন থেকে পৃথক করে নিজের আয়ত্তে পূর্বেই এনেছিল, এবার আক্রমণ করল চীন মূল ভূখণ্ড ১৯৩৩সালে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ইতালি আফ্রিকার একটি দেশ আবিসিনিয়াকে জয় করল। ১৯৩৬ সালেই ইতালি এবং জার্মানীর গোপন সহযোগিতায় মাদ্রিদের সাধারণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষিত হোল। দীর্ঘ দু-বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। নির্মমভাবে শহরগুলোর উপর বোমা ফেলা হয়েছিল। এ যুদ্ধে যত স্ত্রী ও শিশু মারা গিয়েছিল পূর্বের কোন যুদ্ধে তা মারা যায়নি।"৮

এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন বলতে এই ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনই ছিল মুখ্য। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ছিল একই ঘটনা। ১৯৩৭ সালে গঠিত হল "League Against Fascism and War" যার সর্বভারতীয় কমেটির সভাপতি হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাপানী সৈনিকদের ব্যঙ্গ করে তিনি লিখলেন 'বুদ্ধ ভক্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি কবিতা।

এই সময় ভারতবর্ষে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় ৪০জন বিপ্লবীকে দণ্ড দেওয়া হয়। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় ২৯জন বিপ্লবীকে দণ্ড

দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠা হয় 'লেখক সঙ্ঘ', 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ', 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ', 'নিখিল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘ'। ১৯৩৭সালে আন্দামান জেলে বন্দীদের নিঃর্শত মুক্তি সর্ম্পকে টাউন হলে সভা হল, উত্তরপ্রদেশ ও কানপুরে সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়, প্রায় ৪০হাজার শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ গ্রহন করে। ১৯৩৮সালে পশ্চিমবঙ্গে চটকল শ্রমিক ধর্মঘট, ইস্পাত শ্রমিক ধর্মঘট চলে। ১৯৪০সালে জাপান কর্তৃক ভারত ও চীন আক্রমণ হয়, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক তৎকালীন পাঞ্জাব গভর্নর মাইকেল ডায়ারকে হত্যা করা হয়, মুসলিম লিগ 'ধর্মভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রে'র দাবি তুললো। এইসব ঘটনা বিশেষ করে কলকাতায় জাপানের আক্রমণকে সুকান্ত কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর মনের ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয় যায় বন্ধু অরুণাচলকে লেখা চিঠিতে-

"---ম্লানায়মান কলকাতার ক্রমন্তস্বমান স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর মাঝে-মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। এই হল কলকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এই চিঠি পৌঁছবে কি না; জানি না ডাক বিভাগ ততদিন সচল থাকবে কি না। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন-সন্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে। ---এক-একটি দিন যেন মহাকালের এক-একটি পদক্ষেপ, ---বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর, অরুণ?"[৯]

যে কলকাতাকে সুকান্ত মায়ের মত ভালবেসেছে, যার স্নেহে তাঁর এত গুলো বছর কেটেছে সেই কলকাতার ধ্বংসকে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

তিনি সমস্ত পৃথিবী দেখেননি, এই কলকাতাতেই তিনি সমস্ত পৃথিবীকে দেখেছেন। তাই তিনি জানেন যে এই বিপদ থেকে শহরকে রক্ষা করতে হলে তার মূল্য দিতেই হবে। তাই তিনি চেয়েছেন সকলকে জাগিয়ে তুলতে, চেয়েছেন সকলে একসাথে একজোট হয়ে দেশের জন্য সংগ্রাম করতে। তিনি মানুষের কাজ করতে চেয়েছেন মানুষের সাথে মিশে, তাদের মাঝে থেকে। মেজ-বৌদিকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন-

"আমি কবি বলে নির্জনতা প্রিয় হব, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই। সুতরাং সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান।"[১০]

যদিও চিঠিটি তাঁর কমিউনিস্ট হবার অনেক পরে লেখা। তিনি ১৯৪১-৪২ সালেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন আর চিঠিটি লেখা ১৯৪৫-এ। আসলে যেটা বলার বিষয়, তিনি কিন্তু তথাকথিত কবির সংজ্ঞা বদলে-দিচ্ছেন, তিনি নিজেই বলেছেন যে কবি মানেই নির্জনতা প্রিয় হতে হবে এমন কোন মানে নেই, প্রকৃত অর্থে চল্লিশের দশকে বা তার আগের দশক থেকেই বাংলা কবিতা যে অন্যধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে তা কবির মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে। সুকান্তের আগে ১৩৪৫-এ বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় সমর সেন লিখেছিলেন-

"অনেকে বলেন কবিতা আসে শুধু অন্তঃ-প্রেরণার তাগিদে। কথাটি বলা সহজ, কিন্তু সঠিক নয়, কারণ অন্তঃ-প্রেরণা শুধু অন্তরের জিনিস নয়, তার মূল উৎস বিশাল ও বিক্ষুব্ধ বহির্জগত।"[১১]

আর এই বহির্জগতের জন্যই সুকান্ত হয়ে উঠেছে জনগণের কবি। তাইতো তিনি বলেন 'কবির চেয়েও বড় কথা আমি কমিউনিস্ট' আসলে এখানে

সুকান্ত শুধু একজন কবি হয়ে চার দেওয়ালের ভেতর জীবন অতিবাহিত করতে চাননি, তিনি জনতার সঙ্গে মিলে মিশে মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়েছেন। তিনি যে প্রকৃত পক্ষেই একজন সমাজ কর্মী সেটাই ধরে পড়েছে তাঁর চরিত্রে এবং সর্বপরি তাঁর কবিতাতেও। আর তিনি জানতেন এই কাজ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই একটা পথ বেছে নিতে হবে আর তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিকে। তাঁর এই পার্টিতে যোগদানের বিবরণটা অনেকটা এরকম-

"দাদার বন্ধুরা নিয়মিত তাঁদের বাড়িতে আসতেন। বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিস্ত হিটলারের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ-এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত। সুকান্ত এ-সব আলোচনা শুনতেন। তাঁর মনে নানা প্রশ্ন ভিড় করত।

অগ্রজ সুশীলের বন্ধু বারিন্দ্রনাথ ঘোষের সক্রিয় উদ্যোগে সুকান্ত মার্কসবাদের দিকে ঝোঁকেন। এর আগে 'বারীনবাবুরা বিবেকানন্দ ইত্যাদি নিয়েই থাকতেন। সুকান্ত ১৯৩৯ নাগাদ বিবেকানন্দের ওপর একটি কবিতা লিখেছিলেন'! বিবেকানন্দ বিষয়ে 'শিখা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালের ছাত্র আন্দোলন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত বারীনবাবুদের মনে যে-প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল তার সবগুলির সদুত্তর বিবেকানন্দে পাওয়া গেল না। ঝুঁকলেন মার্কসবাদী সাহিত্যের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সুকান্ত। তাঁরা গোর্কি পড়তে আরম্ভ করলেন। অনেক আগেই বিমল সেন গোর্কির 'মা' উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এই বই সুকান্ত-সহ সবাইকে গভীরভাবে নাড়া দিল। পরে তাঁরা পড়লেন যুদ্ধের ওপর লেখা ইলিয়াবুর্গের 'ফল অব প্যারিস।' ধীরে ধীরে মার্কসবাদী আলোচনার জমি তৈরি হল। 'বারীনবাবু ও অন্যান্য কমিউনিস্টদের চেষ্টায় বেলেঘাটার একটা পোড়ো বাড়িতে গড়ে উঠল এক কমিউনিস্ট পাঠ-চক্র। ---গোড়া থেকেই সুকান্ত এই চক্রে নিয়মিত আসতেন।"[১২]

এইভাবেই সুকান্ত হয়ে ওঠে কমিউনিস্টের একনিষ্ঠ কর্মী। আর ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বরাবরই আপসহীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করেছে। আর সুকান্ত যেহেতু একজন কমিউনিস্ট, তাই তিনি কোনোদিনই ফ্যাসিবাদকে সহ্য করেননি এবং তার বিরুদ্ধেই লিখে গেছেন একের পর এক কবিতা। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি লাহোরে অনুষ্ঠিত হওয়া এক সম্মেলনে ফ্যাসিবাদ সর্ম্পকে এক হতাশাজনক সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এর ফলে কমিউনিস্টরা বুঝতে পারে যে এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করলে ফ্যাসিবাদকে আটকানো সম্ভব হবে না, তাই তারা তার বিরুদ্ধ অবস্থান নেন। কমিউনিস্ট নেতা অজয় কুমার ঘোষ 'নিউ এজ' পত্রিকায় লিখলেন-

"এই মনোভাব যে এই যুগটা হচ্ছে প্রতিবিপ্লবের যুগ এবং ফ্যাসিবাদের জয় অবশ্যম্ভাবী তা জনগণের মনে অবশ্যই হতাশা সৃষ্টি করবে। জনগণের ফ্রন্টের বিপরীতে শ্রমিক-শ্রেণীর ফ্রন্টের স্লোগান শ্রমিক-শ্রেণীকে তার স্বাভাবিক মিত্র, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, তার শক্তি, তার অভ্যন্তরীণ সংহতি এবং তার সোসালিস্ট গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস হারানো গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়-যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা এবং অনুপ্রেরণা সঞ্চারকারী হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই সব ফ্যাসিস্ট অগ্রগতিকেই সাহায্য করছে।"১৩

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সীমিত শক্তি নিয়েই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ে যায়। হিটলার কিন্তু চেয়েছিলেন যে ভারত ব্রিটিশের অধীনেই থাকুক। এদিকে ব্রিটিশরা আবার স্পেন সর্ম্পকেও প্রচুর কূটনীতি চালাতে থাকে। কমিউনিস্টরা তারও বিরোধীতা করে। 'ন্যাশনাল ফ্রন্টে'র সম্পাদকীয়তে লেখাহয়-

"দুই বৎসর যাবৎ দুই যুদ্ধ-দানব হিটলার ও মুসোলিনির আক্রমণ প্রতিরোধে স্পেন অঝোরে রক্ত ঝরাচ্ছে। বিশ্ব দানব হিটলার ও মুসোলিনি এই এই খেলায় একক

নয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইনের ঘৃণ্য ছায়া এই ডিক্টেটারদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের পরস্পরের যুদ্ধে প্রতি উৎসাহ যোগাচ্ছে। চেম্বারলেইনই মুসোলিনিকে সাহায্য করছে সহস্র সহস্র স্পেন-বাসীকে হত্যা করা এবং স্পেনের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারার জন্য।"[১৪]

ভারতে যারা ফ্যাসিবাদের বিরোধীতা করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রগণ্য ভূমিকায়। ১৯২৬ সালে তিনি যখন মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালি গিয়েছিলেন, তখনই তিনি সেখানকার ফ্যাসিবাদের চেহারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি উদ্বেগ হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেন সি. এফ. এন্ডুজকে লেখা এক পত্রে-

"ফ্যাসিবাদের পদ্ধতি ও নীতিগুলি সমগ্র মানবজাতির নিকটই উদ্বেগের কারণ এবং এটা চিন্তা করা অবান্তর যে আমি এমন কোন আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারি যা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে দমন করে, ব্যক্তিকে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করে এবং হিংসার এক রক্তাক্ত এবং চক্রান্তমূলক অপরাধের পথে বিচরণ করে---"[১৫]

শুধু রবীন্দ্রনাথ নয় অনেকেই এই ফ্যাসিবাদের বিরোধীতা করে নিজের মতো করে-

"১৯৪২ এর জুলাই মাসে 'জনযুদ্ধের গান' নামক একটি সংগীতের সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে বিনয় রায়ের চাষি গেরিলার গান 'হোই হোই হোই', হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান', মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোভিয়েত ভূমি বিশ্ব-শ্রমিক প্রিয়', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বজ্র কণ্ঠে তোলো আওয়াজ', প্রভৃতি গান ছিল।"[১৬]

এই 'জনযুদ্ধের গান' ১৯৪২-এরই সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় সেখানে সুকান্ত ভট্টাচার্য লেখেন-

"জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ

শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ,

জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন

মিলছে ভারত বীর মহাচীন।

সাম্যবাদীরা আজ মহা ক্রুদ্ধ

শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।

জনগণ শক্তির ক্ষয় নেই,

ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।

নিষ্ক্রিয়তায় তবে কেন মন মগ্ন

কেড়ে নাও হাতিয়ার, শুভলগ্ন।

করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ;

শুরু করো, প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।।"

('জনযুদ্ধের গান', 'অপ্রচলিত রচনা')

শুধু এখানেই শেষ নয়, এই ফ্যাসিবাদের বিরোধীতা করে তিনি অনেক কবিতা লিখলেন, সেগুলি হল 'বিবৃতি', 'চট্টগ্রাম:১৯৪৩', 'পরিখা', 'মৃত পৃথিবী', 'রোম:১৯৪৩', 'মণিপুর', 'উদ্যোগ', 'দিনবদলের পালা', 'প্রিয়তমাসু', 'ছুরি', 'পরাভব' প্রভৃতি।

'বিবৃতি' কবিতায় তিনি বলেন-

"পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে,

বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে,

নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্থ বিদেশী শাসন,

ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকটনাশন।

সহসা অনেক রাত্রে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে

দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে।"

('বিবৃতি', 'ছাড়পত্র')

একজন কবি কতটা সমাজ সচেতন হলে কতটা সংবেদনশীল হলে এই ধরণের কথা বলতে পারেন। সমাজ সর্ম্পকে মানুষ সর্ম্পকে কতটা উদ্বেগ তাঁর, যার ফলশ্রুতি এই কবিতা গুলি। 'মধ্যবিত্ত ৪২' এরকমই একটি কবিতা। সেখানে তিনি সমাজের হাল ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি এটাও জানেন যে সে কাজ এতটা সহজ নয় কারণ, দিকে দিকে ছড়িয়ে রয়েছে ফ্যাসিবাদের হিংস্র চোখ। তিনি বলেন-

"পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে,

আজকে সকলে ভুগছে একযোগে,

এখানে খানিক তারই পূর্বাভাস

পাচ্ছি, এখন বইছে পুব-বাতাস।

উপায় নেই যে সামলে ধরব হাল,

হিংস্র বাতাস ছিঁড়ল আজকে পাল,

গোপনে আগুন বাড়ছে ধানক্ষেতে,

বিদেশী খবরে রেখেছি কান পেতে।

সভয়ে এদেশে কাটছে রাত্রিদিন,

লুব্ধ বাজারে রুগ্ন স্বপ্নহীন।

--- --- ---

এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে

আবার বোমারু রক্ত পান করে,

ক্ষুব্ধ জনতা আসামে, চাটগাঁয়ে,

শাণিত-দ্বৈত-নগ্ন অন্যায়ে;

তাদের স্বার্থ আমার স্বার্থকে,

দেখছে চেতনা আজকে এক চোখে।।"

('মধ্যবিত্ত:৪২', 'ছাড়পত্র')

'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থের 'উদ্যোগ' কবিতাতেও আমরা পাই জাপানের আক্রমণের বর্ণনা-

"মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,

একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।"

('উদ্যোগ', 'পূর্বাভাস')

কিন্তু কবি সুকান্ত কোন কালেই এই আক্রমণকে ভয় পেতে বলেননি। তিনি সর্বদাই জনগণকে জাগতে বলেছেন তাদের চিত্তকে সুতীক্ষ্ণ করতে বলেছেন। তাই তিনি কারখানায় শ্রমিকদের, মাঠে কৃষকদের দৃঢ় হতে বলেছেন। জবাব দিতে বলেছেন শত্রু দলকে। তাইতো তিনি লিখলেন 'জবাব'-

"শ্রমিক দৃঢ় কারখানায়, কৃষক দৃঢ় মাঠে,

তাই প্রতিক্ষা, ঘনায় দিন স্বপ্নহীন হাটে।

তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড়

পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির।।"

('জবাব', 'অপ্রচলিত রচনা')

কলকাতায় জাপানের বোমার আক্রমণের ভয়ে মানুষ এক থাকতে পারে না সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়, মানুষ সব পালিয়ে যায়। ছাত্রনেতা অন্নদাশংকর এই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন 'সুকান্ত স্মৃতি' গ্রন্থে-

"১৯৪১ থেকে জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতার মানুষ লাখে লাখে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কলকাতার আকাশে তখন ঘন ঘন জাপানী বোমারু বিমানের আনাগোনা। দিনের কলকাতাও জনশূন্য। রাতনিষ্প্রদীপ। ভয়ে সব শব্দহীন। মাঝে মাঝে মিলিটারি গাড়ি বা বুটের শব্দ। বহু রাতের অন্ধকারে আমি আর সুকান্ত পথে বেরিয়েছি কলকাতার এই প্রেত রূপ দেখার জন্য।"[১৭]

কিন্তু সুকান্ত বুঝতে পারে যে পালিয়ে গেলে চলবে না কারণ পালিয়ে গেলে তো মুক্তি আসবে না, মুক্তি আসবে বিপ্লবে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে, তাই কৃষক, শ্রমিক সকলকে এক হতে হবে। তাই তিনি এই ঐক্যতার বাণী বার বার বলে ওঠেন তাঁর কবিতায়-

"দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে-

এখনো শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা

বিধ্বস্ত বাংলাকে?

আজকের এ মুহূর্তে অবসন্ন শ্মশানস্তব্ধতা,

কেন তাই মনে মনে আমি প্রশ্ন করি সেই কথা।

তুমি কি ক্ষুধিত বন্ধু? তুমি কি ব্যাধিতে জরোজরো?

তা হোক, তবুও তুমি আর এক মৃত্যুকে রোধ করো।

বসন্ত লাগুক আজ আন্দোলিত প্রাণের শাখায়,

আজকে আসুক বেগ এ নিশ্চল রথের চাকায়,

এ মাটি উত্তপ্ত হোক, এ দিগন্তে আসুক বৈশাখ,

ক্ষুধার আগুনে আজ দ্বিতীয় মৃত্যুর ছদ্মবেশ,

তবু কেন নিরুত্তর প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা দেশ?

এদেশে কৃষক আছে, এদেশে মজুর আছে জানি,

এদেশে বিপ্লবী আছে জনরাজ্যে মুক্তির সন্ধানী।

দাসত্বের ধুলো ঝেড়ে তারা আজ আহ্বান পাঠাক,

ঘোষণা করুক তারা এ মাটিতে আসন্ন বৈশাখ।"

('মণিপুর', 'ঘুমনেই')

ফ্যাসিস্ট বাহিনী যখন সমস্ত পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তখন ১৯৪১-এর ২৯সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত এক সম্মেলন চলে মস্কোতে। সেখানে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এক হয় এবং তারা এই সিদ্ধান্তে ঐকমত হয় যে, এই ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে তারা পরস্পরকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য করবে। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য পাওয়াতে ফ্যাসিস্ট বিরোধী শক্তির উন্নতি হয়। ফল স্বরূপ দেখাগেল ১৯৪১-এই ডিসেম্বরে মস্কোর যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হল। অন্যদিকে জাপান অতর্কিতে মার্কিন

নৌঘাঁটি পার্লহারবারে আক্রমণ করে শুধু তাই নয় ১৯৪১ শেষ থেকে ৪২-এর মার্চ পর্যন্ত জাপান বিভিন্ন দেশ যেমন ফিলিপিনস্, থাইল্যান্ড, বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া দখল করে। এর পরেই শুরু হয় বিভিন্ন যুদ্ধ ঘোষণার পালা। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না, তাই ১৯৪২-এর সূচনা লগ্নেই বিশ্বের ২৬টি দেশের মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি হল 'ডিক্লারেশন অফ ইউনাইটেড নেশনস'। সেখানে চুক্তি হল ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে কোন দেশ একক ভাবে কোন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করবে না। এর ফলে ফ্যাসিস্ট বিরোধী শক্তি আরো বৃদ্ধি পেল। অবশেষে ১৯৪৩এ আফ্রিকায় জার্মান এবং ইতালির ফ্যাসিস্ট বাহিনী আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হল, এবং ১৯৪৩-এই ইতালিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট ও আন্দোলণের ফলে মুসোলিনি তার প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখলেন-

"ভেঙ্গেছে সাম্রাজ্যস্বপ্ন, ছত্রপতি হয়েছে উধাও;

শৃঙ্খল গড়ার দুর্গ ভূমিসাৎ বহু শতাব্দীর।

'সাথী', আজ দৃঢ় হাতে হাতিয়ার নাও'-

রোমের প্রত্যেক পথে ওঠে ডাক ক্রমশ অস্থির।

উদ্ধত ক্ষমতালোভী দস্যুদের ব্যর্থ পরাক্রম,

মুক্তির উত্তপ্ত স্পর্শে প্রকম্পিত যুগ যুগ অন্ধকার রোম।

--- --- ---

ভেঙ্গে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ

বিক্ষুব্ধ অগ্নুৎপাতে উচ্চারিত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ।

যে উদ্ধত একদিন দেশে দেশে দিয়েছে শৃঙ্খল

আবিসিনিয়ার চোখে আজ তার সে দম্ভ নিষ্ফল।"

('রোম:১৯৪৩', 'ঘুম নেই')

এরপর আমরা স্তালিনগ্রাদের জয়ের বর্ণনাও পাই তাঁর 'লেনিন' কবিতায়। কত কষ্টের সাহায্যে লেনিনের নেতৃত্বে সর্বহারারা ১৯৪৩-এ এক নবযুগের সূচনা করে। এবং এই লেনিনের নেতৃত্বেই রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ। লেনিন তাই কমিউনিস্টদের কাছে আদর্শ রূপে পরিগণিত হয়। সুকান্ত কমিউনিস্ট হওয়ায় তাই তাঁর কবিতায় পাই সেই লেনিন বন্দনা-

"লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,

অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।

আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে

হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,

মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন

ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্ষীত দিন,-

বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ;

-আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।"

('লেনিন', 'ছাড়পত্র')

সুকান্ত শুধু এই জয়েই খুশি থাকলেন না, তিনি চাইলেন এই শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক আমাদের ভারতবর্ষেও, তাই তিনি বলেছেন অনেক যুদ্ধ হয়েছে অনেক রক্ত পাত হয়েছে, আর যুদ্ধ নয় এবার শুরু হোক দিন বদলের পালা-

"পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ, বন্ধ সৈনিকের রক্ত ঢালা:

ভেবেছো তোমার জয়, তোমার প্রাপ্য এ জয়মালা;

জানো না এখানে যুদ্ধ-শুরু দিনবদলের পালা।।"

('দিন বদলের পালা', 'ঘুম নেই')

শুধু এখানেই শেষ নয়, এরপর বাংলায় দেখাদিল ভয়াবহ মন্বন্তর। ছোটোবেলা থেকে মানুষের সেবা করার যে ইচ্ছে বাস্তবে তা রূপ পেল ১৯৪৩-এর এই মন্বন্তরের মধ্যে দিয়ে। ছাত্র এবং কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে বেলেঘাটার 'জনরক্ষা সমেতি'র সকলের সঙ্গে এক হয়ে সুকান্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। শুধু স্বশরীরে মানুষের সেবা করেই ক্ষান্ত থাকলেন না কবি সুকান্ত। কবি হিসাবে তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরলেন দুর্ভিক্ষের করুণচিত্র। 'সুকান্ত স্মৃতি' গ্রন্থে অবন্তী সান্যাল বলেছেন-

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই মধ্যবর্তীকালে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সংকটময় পর্বে, দেশবাসী দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায়, বিপর্যস্ত সমাজজীবনে একদল সচেতন তরুণের কাছে রাজনীতি অকস্মাৎ অতি প্রত্যক্ষ বস্তুরূপে ধরা পড়েছিল, এই প্রথম রাজনীতি একটি সম্পূর্ণ জীবনবোধ ও আচরণের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিশোর সুকান্ত এই রাজনীতির অংশীদার হয়েছিল, সে সোজাসুজি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ছিল। এই রাজনীতির প্রেরণায় একেবারে গোড়া থেকেই সে ছিল সর্বক্ষণের কর্মী এবং তার কর্ম ছিল তার কবিত্বের পরিপূরক। রেশনের লাইনের তিক্ত অভিসম্পাতে, লঙ্গরখানার করুণ কোলাহলে, মিছিলের উল্লাসে-চিৎকারে যে-ক্ষোভ যে-

বেদনা যে-আশা যে-উদ্দীপনা তাকে কেমন করে ভাষা দিতে পারা যায়? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অতি-প্রত্যক্ষ এই ক্ষোভ-বেদনা-আশা-উদ্দীপনাকে কোন তীর্যক্ বক্রভাষণে প্রকাশ করা সম্ভব? অনুভব যেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ ভাষাকে সেখানে অবশ্যই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ হতে হবে।"[১৮]

রেশনের লাইনের যে বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘটনা, দু-মুঠো ভাতের জন্য গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ চলে আসে শহরে তাদের অসহায় মুখের ছবি, মানুষ যেন সব কঙ্কাল হয়ে গেছে এ সব ছবি নিজের চোখে দেখে কবি সুকান্ত লিখেছেন- 'বিবৃতি', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'বোধন', 'ফসলের ডাক', 'এই নবান্নে' প্রভৃতি কবিতা। 'বিবৃতি' কবিতায় কবি আঁকলেন মন্বন্তরের চিত্র-

"আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,

জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,

দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,

প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ

রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ;

বুভুক্ষা বঁধেছে বাসা পথের দুপাশে,

প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ ক্রমে ক্রমে আবরণহীন

নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন,

পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,

দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দরমহলে!

দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,

নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা আন্তিম সম্বল;

রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,

বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে।"

('বিবৃতি', 'ছাড়পত্র')

'বিবৃতি' কবিতা প্রসঙ্গে অশোক ভট্টাচার্য লিখেছেন-

"পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে মানবতার অপমৃত্যু স্বচক্ষে দেখলেন সুকান্ত। *বাংলা দেশের চাষী-জনগণের যে অপমান সংগঠিত হল কলকাতার উন্মুক্ত রাজপথে, তার সবটুকু বেদনাই যেন তাঁর সদ্যস্ফুট অন্তরকে দীর্ণ করে দিল। তাই সে-দিন চিরাচরিত অলংকারের নীতিশীলতা বর্জন করেও ছন্দে তিনি যে 'বিবৃতি' লিখলেন তা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মতো ভিন্ন রাজনৈতিক মতের সমালোচকের কাছ থেকেও "সহৃদয়াহ্লাদকারিস্পন্দসুন্দর" কাব্য বলে অভিনন্দন পেয়েছে।"*[১৯]

রেশনের লাইনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বললেন 'ঐতাহাসিক' কবিতায়-

"একদা দুর্ভিক্ষ এল

ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়

পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে

ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান

একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।

চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?

এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।

কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,

তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।"

('ঐতিহাসিক', 'ছাড়পত্র')

এরপর 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় দেখবো কবি নিজেকে দুর্ভিক্ষের কবি বলে চিহ্নিত করেছেন। কবিতার প্রথমে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা, তাঁর যে অন্তরের টান তা স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথের গানে উদ্বেল হয়েও,রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে কবিতা পাঠ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি'। তাই সুকান্ত বিশ্বকবি কে উদ্দেশ্য করে কবিতা লেখা শুরু করলেও তা শেষ পর্ষন্ত হয়ে ওঠে এক দুঃসময়ের চিহ্ন-

"তবুও নিশ্চিত উপবাস

আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস-

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,

প্রত্যেহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতিক্ষায়,

আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,

আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,

আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।"

('রবীন্দ্রনাথের প্রতি', ছাড়পত্র')

এই কবিতায় 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি' এবং 'নিশ্চিত উপবাস' এই কথা গুলি শুনে আমরা যদি তাঁর পরিবার বা ব্যক্তিগত জীবন অনটনে কেটেছে ভাবি তাহলে হয়তো আমাদের একটু ভুল বোঝা হবে কারণ তাঁদের পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসা কিন্তু সে সময় খুব খারাপ ছিল না, ফলে তাঁদের পরিবারে তেমন কোন অনটন ছিল না। আসলে সময় এবং সমাজ সচেতন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর পারিপার্শ্বিক চিত্র, সাধারণ মানুষের অনটন, দুঃখ, দুর্দশার কথাই তুলে ধরেছেন নিজের মধ্য দিয়ে। এরপর যদি আমরা 'বোধন' কবিতাটিকে দেখি, দেখবো সেখানে কবি দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং সরাসরি দোষারোপ করেছেন মজুতদার-কালোবাজারিদের। তারা গরীব কৃষকদের ক্ষেতের ফসল, নিজেদের গুপ্ত ঘরে মজুত করে রেখেছে যার ফল স্বরূপ এই দুর্ভিক্ষ। তারা এতটাই হৃদয়হীন যে সাধারণ মানুষ যেখানে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে সেখানে মজুতদাররা গুনছে কোটি কোটি মুদ্রা, এরূপ জঘন্য ছবিও আমরা দেখতে পাই সুকান্তের কবিতায়। তিনি বলেন-

"এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি

নীরব মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি;

কোথাও নেইকো পার

মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার

আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,

এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,

ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,

হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।"

('বোধন', 'ছাড়পত্র')

'মহাত্মাজীর প্রতি' কবিতাতেও পাই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা-

"এসেছে বন্যা, এসেছে মৃত্যু, পরে যুদ্ধের ঝড়,

মন্বন্তর রেখে গেছে তার পথে পথে স্বাক্ষর।"

('মহাত্মাজীর প্রতি', 'ঘুম নেই')

চারিদিকের এই পরিস্থিতিতে সুকান্তের মনে ঘন অন্ধকার ছেয়ে এসেছিল। বন্ধু অরুণাচলের একটি লেখা দেখলেই আমরা তাঁর মনের তৎকালীন পরিস্থিতি বুঝতে পারবো। বন্ধু অরুণাচল লিখেছেন-

"ব্ল্যাক আউটের সময়ে দাদার বিয়ে উপলক্ষে নতুন বৌদিকে উপহার দেবার জন্য একটি ছোটো কবিতা লেখে সুকান্ত; শেষ পর্যন্ত কি জন্য যেন উপহারটা আর দেওয়া ঘটে উঠে না। সেখানি আপাতত হাতের কাছে নেই, কেবল কটা লাইন মনে আছে :

'এ শহর নিস্প্রদীপ, নিস্প্রদীপ আমাদের ঘর,

জমেছে উদাস ধুলো অনাদৃত বৎসর বৎসর।

এখানে কখনো কেউ পায়নিকো বসন্তের হাওয়া,

তাইতো এখানে ব্যর্থ সঋদয় চাওয়া আর পাওয়া।'

'দারিদ্র্য অনবগুণ্ঠিত' এবং এখানে কৃপণ বায়ু, এখানে চাঁদও কুণ্ঠিত। এই জীর্ণ অন্ধকার ঘরে আসবার আগে নতুন বধূকে তাই সে আবেদন জানিয়েছিল-

'একটি প্রদীপ এনো, এখানে কখনো যদি আসো'।"[২০]

সুকান্তের মন ছিল এমনিভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত, সে একটু আলোর সন্ধান করেছে, কিন্তু আলোর দেখা সে কোথাও পায়নি, তাঁর

ব্যক্তিগত জীবনে মা, রাণীদি, দাদার মৃত্যুর পর থেকে নেমে এসেছিল এই অন্ধকার। আর তাকে আরো ঘনিভূত করে তুলেছিল দেশের এই পরিস্থিতি। 'ফসলের ডাক:১৩৫১' কবিতায় তিনি বললেন-

"জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে,

দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভান্ডারে;

তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,

শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

পরাস্ত অনেক চাষী; ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ-

জ্বলন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ,

তাদের ফসল প'ড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসন্ধানী

তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি-

আমাকেই কাস্তে নিতে হবে।

নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,

উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,

সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত:

তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে।।"

('ফসলের ডাক:১৩৫১', 'ছাড়পত্র')

লক্ষ্য করার মত বিষয়, সুকান্ত কিভাবে সকলের দুঃখ, কষ্টকে নিজের করে নিচ্ছেন এবং এই দুঃসময় থেকে উত্তরণের চেষ্টা করছেন, শুধু চেষ্টা নয় তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাইতো বলেছেন 'তোমাদের বাঁচানোর

প্রতিজ্ঞা আমার'। তিনি এই দুর্দিনেও জীবনের সংকেত দেখতে পাচ্ছেন, সকলকে জেগে উঠতে বলছেন বার বার আর বলেছেন এবার কাস্তে তিনি নিজে হাতে নেবেন, যেন আর কাউকে না খেয়ে থাকতে না হয়, ঘরের ফসল তিনি ঘরে তুলবেন, মজুতদার দের আর ফসল দেবেন না। তাঁর বিশ্বাস সকল অনাহারের কাছে তাদের দুঃস্বপ্ন ভেঙে গিয়ে আসবে সোনালী দিন। তাই আশাবাদী কবি 'এই নবান্নে' কবিতায় বলেন-

"এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,

আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান-

পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।

--- --- ---

কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসে নি শুভক্ষণ-

তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।

এবার নতুন জোরালো বাতাসে

জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,"

('এই নবান্নে', 'ছাড়পত্র')

আসলে বিপ্লবী কবির মুখে আমরা কোন দিনই হেরে যাবার কথা শুনতে পারিনি। তিনি সব সময় সকলকে উজ্জিবিত করেছেন, জয় আসবেই তিনি দৃঢ় সংকল্প করতে বলেছেন, আওয়াজ তুলতে বলেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কখনো কোনো কারণে ভয় না করার কথা শুনিয়ে গেছেন তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। 'কৃষকের গান' কবিতায় তিনি বলেছেন-

"এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে

এইবার ফলাব ফসল-

আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে

আজ তার নির্জন বোধন।

এ মাটির গর্ভে আজ আমি

দেখেছি আসন্ন জন্মেরা

ক্রমশ সুপুষ্ট ইঙ্গিতে;

দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর!"

('কৃষকের গান', 'ছাড়পত্র')

আসলে এইসব কবিতার পেছনে রয়েছে তাঁর জীবন দিয়ে উপলব্ধিকরা দৃশ্যের প্রতিফলন, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার খবর সংগ্রহের জন্য তিনি যখন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেরান তখনই তিনি এই সমস্ত দৃশ্য দেখেন। আর সেগুলি দাগ কেটে যায় তাঁর মনে যা পরে কবিতার রূপ ধারণ করে। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা থেকেই জানা যায় ১৯৪৩-এ কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সেবা-স্বাধীনতা'র আদর্শে 'কিশোর বাহিনী' নামে কিশোরদের নিয়ে একটি সংগঠন করা হয়েছিল, সুকান্ত ভট্টাচার্য সে সংগঠনের প্রধান কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সংগঠনকে পরিচালনা করেন। সুকান্তের শারীরিক অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না তিনি মাঝে মাঝেই আসুস্থ হয়ে পরতেন কিন্তু শরীর তাঁকে আটকাতে পারেনি, শত অসুবিধা নিয়েও তিনি 'কিশোর বাহিনী'র কাজ করতেন। বন্ধু অরুণাচলকে লেখা এক চিঠিতে আমরা পাই-

"দোস্ত,

কয়েকটা কারণে আমার তোর ওখানে যাওয়া হল না। যেমন:

১। কিশোর বাহিনীর দুধের নতুন আন্দোলন শুরু হল।

(১৪ই জুনের 'জনযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য।)

২। ১৫ই জুন A.I.S.F conf.

৩। কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয়নি। ছাপাব।

৪। ১৩ই জুন I.P.T.A –এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে।

৫। ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরী মিটিং।

৬। কিশোর বাহিনীর ৪নং চিঠি এই সপ্তাহে লিখতে হবে।

৭। ১৬ই জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত।

৮। এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

তোদের ওখানকার কিশোর বাহিনীকে আমায় ক্ষমা করতে বলিস। নতুন আন্দোলনের জন্যে রমাকৃষ্ণ আমায় ছাড়লো না।"[২১]

এই প্রসঙ্গে মনে পরে যায় তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির কথা। যদিও কবিতাটি সুকান্ত নিজে কত বছর বয়সে লিখেছিলেন তা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও, বলা যায় সুকান্ত যখন কিশোর বাহিনী নিয়ে ১৯৪৪ সালে কাজ করেছেন তখন কিন্তু সুকান্তের বয়স আঠারো ছিল। আর তাই কিশোর বাহিনীকে উৎসাহ, উদ্দীপনা দেওয়ার জন্যই হয়তো এই কবিতা তিনি লিখেছিলেন-

"আঠারো বছর বয়স কি দুঃসহ

স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুকি,

আঠারো বছর বয়সেই অহরহ

বিরাট দুঃসাহসের দেয় উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়

পদাঘাতে চাথ ভাঙতে পাথর বাধা,

এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-

আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্ত দানের পুণ্য

বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,

প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটি থাকে না শূন্য

সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

--- ---- ---

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার

পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,

দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার

ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

--- --- ---

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়

পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,

এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-

এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।।"

('আঠারো বছর বয়স', 'ছাড়পত্র')

আসলে সুকান্তের সমগ্র কাব্য জগৎ জুড়েই রেয়ছে দাঙ্গা, রক্ত, আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহ- এই সব দুঃসময়ের চিত্র। তাই তো ১৯৪৬-এর আগস্টে পাকিস্থানের দাবিতে মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-কে কেন্দ্র করে দেশে যে বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরিধী আন্দোলন চলছিল তা পরিণত হল ভয়ংকর ও মর্মান্তিক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায়। সেই দাঙ্গার রেশ চলে বহু দিন ধরে এবং তা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। দাঙ্গার রক্তে কালিমালিপ্ত হয় শহর কলকাতাও। সুকান্ত যেন এই ঘটনা গুলির দিন-পঞ্জিকা লিখেগেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর বেদনাবিধুর হৃদয়ের পরিস্থিতি ভাষায় রূপ পায় 'সেপ্টেম্বর ৪৬', 'চরমপত্র', 'ঐতিহাসিক', 'শত্রু এক', 'মুক্তবীরদের প্রতি', 'একুশে নভেম্বর ১৯৪৬', 'ডাক' প্রভৃতি কবিতায়। 'সেপ্টেম্বর ৪৬' কবিতায় কবি বলেন-

"কলঙ্কিত কালো কালো রক্তের মতন

অন্ধকার হানাদেয় অতন্দ্র শহরে;

পথচারী কুকুরের দল

মানুষের দেখা দেখি

স্বজাতিকে দেখে

আস্ফালন, আক্রমণ করে।"

('ঐতিহাসিক', 'ছাড়পত্র')

এরপর আমরা দেখবো 'মুক্ত বীরদের প্রতি' কবিতা। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আনন্দে তিনি এই কবিতা লেখেন। সেখানে তিনি বলেন-

"আজ তোমাদের মুক্তিসভায় তোমাদের সন্মুখে,

শপথ নিলাম আমরা হাজার মুখে:

যতদিন আছে আমাদের প্রাণ, আমাদের সন্মান,

আমরা রুখব গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বান।

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা, বুঝি আরো দিতে হবে

এগিয়ে চলার প্রত্যেক উৎসবে।

তবুও আজ ভরসা, যেহেতু তোমরা রয়েছ পাশে,

তোমরা রয়েছ এদেশের নিঃশ্বাসে।"

('মুক্ত বীরদের প্রতি', 'ঘুম নেই')

যাঁদের জন্য এই কবিতা লেখা, তাঁরা যখন মুক্তি পান তখন কিন্তু সুকান্ত হাসপাতালে জ্বরে ভুগছেন। কিন্তু তাঁরা মুক্ত হয়ে হাসপাতালেই যায় সুকান্তের সঙ্গে দেখা করতে এবং সেই সময় সুকান্ত খুবই আনন্দিত হন এবং এটাই তাঁর জীবনের সেরা পাওয়া হয়ে থেকে যায়। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন মাসতুতো ভাই ভূপেন্দ্র ভট্টাচার্যকে লেখা এক পত্রে-

"কাল আমার জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে

ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গনেশ ঘোষ বললেন-'আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি'। অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন-আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোনো দিনই নিজেকে মনে করি নি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয় নি আমার এই রোগাজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘটনা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বরের এই সন্ধ্যা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।"[২২]

এই চিঠিটি সুকান্ত লিখেছে ১২ সেপ্টম্বর ১৯৪৬সালে আর এর পর থেকেই সে ঘন ঘন অসুস্থ হতে থাকে। তাঁকে শেষে ভর্তি করা হয়েছিল যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে তাঁর ঠিক মত সেবা-যত্ন করা হয় না। সব শেষে ১৩মে ১৯৪৭ সালে সুকান্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবার বর্ণনা দিয়েছেন অনিলকুমার সিংহ এভাবে-

"কাশী মিত্তির ঘাটে শবদেহের অপেক্ষায় বসে বসে দেহ-মন যখন ক্লান্ত, এমন সময়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে সৎকার সমিতির গাড়ি এসে সুকান্তর শবদেহ পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘাটে তখন কয়েকটা চিতা জ্বলছে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারিদিক, কাছেই খঞ্জনী বাজিয়ে কর্কশ গলায় গান ধরেছে একদল লোক।... একটা গাছের নীচে এক টুকরো পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিয়ে রচনা করা হল সুকান্তর শয্যা। তার ছোটোখাটো দেহটিকে শোয়ানো হল তার ওপর।...সেদিন ২৯শে বৈশাখ। ...গতকাল কী ছিল! আজ যেন কী নেই!!"[২৩]

তথ্যসূত্র:-

১। 'সুকান্ত রচনাসমগ্র'-সুকান্ত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২১

২। তদেব,পৃষ্ঠা-২২

৩। সুকান্তের জীবন ও কাব্য'-ড: সরোজমোহন মিত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১১

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৫

৭। 'সুকান্ত রচনাসমগ্র'-সুকান্ত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৭১

৮। 'সুকান্তের জীবন ও কাব্য'-ড: সরোজমোহন মিত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭

৯। 'সুকান্ত রচনাসমগ্র'-সুকান্ত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৬০

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-২৬০

১১। 'কয়েকটি কবিতা'- সমর সেন, সম্পাদনা-সব্যসাচী দেব, তৃতীয় অনুষ্টুপ সংস্করণ, আগস্ট : ২০১২, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা-৫৯

১২। 'সুকান্ত রচনাসমগ্র'-সুকান্ত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৯

১৩। 'ফ্যাসিবাদ অতীত ও বর্তমান (ভারতের প্রসঙ্গ সহ)'-সুকোমল সেন, চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০১২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-২০০-২০১

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-২০১

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-২৪২

১৬। 'সুকান্তের জীবন ও কাব্য'-ড: সরোজমোহন মিত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৩

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা-২৫

১৮। 'সুকান্ত স্মৃতি,' সম্পাদক-সুজিতকুমার নাগ, নতুন সংস্করণ-১৩৯২, করুণা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৬৬

১৯। 'সুকান্ত রচনাসমগ্র'-সুকান্ত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৬৩

২০। 'সুকান্ত স্মৃতি', সম্পাদক-সুজিতকুমার নাগ, নতুন সংস্করণ-১৩৯২, করুণা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২০-২১

২১। 'সুকান্ত রচনাসমগ্র'-সুকান্ত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৮৮-২৮৯

২২। তদেব, পৃষ্ঠা-৩০৬-৩০৭

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৫২